অহঙ্কারী

রমানাথ রায়

একদিন একটা মেয়ে এল। আমি তাকে চিনি। সে আমাদের পাড়াতেই থাকে। রাস্তায় দেখা হলেই সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। কেন হাসে তা জানি না।

মেয়েটি বলল, আমি তোমাকে চাই।

আমি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

—আমি তোমাকে ভালবাসি

—কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি না।

—মিথ্যে কথা। তুমিও আমাকে ভালবাস।

—না। আমি তোমাকে ভালবাসি না। কেন ভালবাসব? কী আছে তোমার?

—আমার মেঘের মতো চুল আছে, ধনুকের মতো বাঁকা ভুরু আছে, হরিণের মতো চোখ আছে, ডালিমের রঙের মতো ঠোঁট আছে, তিলফুলের মতো নাক আছে, কলসির গলার মতো কোমর আছে, তানপুরার মতো নিতম্ব আছে, কলাগাছের মতো উরু আছে, বাতাবি লেবুর মতো বুক আছে এ ছাড়া আমি যখন হেঁটে যাই তখন...

আমি তার কথা শেষ করতে দিলাম না। বিরক্ত হয়ে বললাম, চুপ করো। এসব অনেক শুনেছি। আর এ সব ভাল লাগে না।

—তুমি তাহলে আমার কাছে আর কী চাও?

—আমি জানতে চাই শরীর ছাড়া তোমার আর কী আছে।

—ভালবাসা আছে।

—মেয়েদের ভালবাসায় আমার কোনো আস্থা নেই।

—আমার বাবার অনেক টাকা আছে।

—টাকার আমার দরকার নেই।

—আমি সন্তানের জন্ম দিতে পারি।

—সব মেয়েরাই তা পারে। এ ছাড়া আর কী পার?

—আমি রাঁধতে পারি। ঘরের কাজ করতে পারি।

—এর জন্যে তোমার দরকার নেই। একটা কাজের লোক এসব করতে পারে। আমি জানতে চাই তোমার মেধা আছে।

—মেধা কী?

—মেধা কী জানো না?

—না।

—তাহলে কাউকে জিজ্ঞেস করে এসো। আমি অপেক্ষা করছি।

মেয়েটা তা শুনে চলে গেল। আর তখনই আমার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। মেয়েটাকে আমার ভাল লেগেছে। মেয়েটা আবার ফিরে আসবে তো?

অপেক্ষমান

বলরাম বসাক

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার বহুদিনের পুরানো গার্লফ্রেন্ড। কতক্ষণ ধরে যে অপেক্ষা করছি। আমার ঘড়িটা বহুকাল যাবৎ বন্ধ।

হঠাৎ আমার সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে মা-মাসি মতন এক বয়স্ক মহিলা নামলেন। আরে আরে এ-কী! গলায় মালা পরিয়ে প্রণাম করছেন কেন? সেটা বুঝতে না বুঝতেই আরো কিছু লোক এল বাবু মতন, সাহেব মতন, মিসতিরিমতন, মিসতিরি হেলপার-মতন, কিছু মহিলা এল গিন্নি বান্নি মতন, কলেজ গার্ল মতন। সবাই প্রণাম ঠুকতে ঠুকতে —এ-এ কী কান্ড, কোথথেকে এক গাড়ি ইট এল, বালি এল, সিমেন্ট এল রড এল কাঠ এল বাঁশ এল— কী ব্যাপার ভাই? আমার চারদিক ঘিরে -আ-রে আ-রে হচ্ছেটা কী— দেয়াল তুলছে যে! আনারকলির মতো আমাকে মেরে ফেলবে নাকি। আনারকলি তো মেয়ে ছিল। কিন্তু আমি যে ছেলে। অবশ্য এ কথা ঠিক, সমাজ-মানে না- লোকে মানেনা এমন একটা প্রেমে নিলে যাবার ধান্দায় ছিলাম। ইস্‌স বেশতো চারদিক খোলা ছিল, ঘাস গাছ ফুল ফুল পাখি ডাল সব দেখতে পেতাম। মাথার ওপর ছাদ ঢালাইও—ওহ-আর আকাশ দেখতে পাব না-না তারা না সূর্য না চন্দ্র না এ্যারোপ্লেন...। আর আশ্চর্য, নড়তেও পারছি না, চড়তেও পারছি না। অপেক্ষা করতে হবে বলে আমার এমন নট নড়ন-চড়ন দশা।

ঘন্টা বাজছে শাঁখ বাজছে, অং বং চং শোনাচ্ছে পুরুত ঠাকুর। পিল পিল করে লোক আসছে। মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি। কিন্তু সেই মেয়েটি আর এল না, যার জন্যে অপেক্ষা করে করে পাথর হয়ে গেছি।

অনিমেষ, ক্যারি অন

সমীর রক্ষিত

স্টোভে দম দেবার আগেই জল, সসপ্যান, চা-চিনি, গ্লাস-চামচ সবই টেবিলে ঠিক ঠাক সাজিয়ে নেয় বাপি। স্টোভে দম দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দ এক সময় তাকেও বেশ চাঙা করে তোলে। সকাল সকাল জোর করে ওঠার ফলে যে ঝিমুনির জের থাকে মাথাটা কেন যেন রিম ঝিম করে, সোঁ সোঁ শব্দে তা কেটে যায়। রক্তের মধ্যে যেন এই শব্দ আঁচ তোলে। স্টোভের বার্ণার তখন লাল হয়ে ওঠে। আর বাপির হাত-পাও ঝটপট চলতে শুরু করে, মুখেও কথা ফোটে। হাতে চায়ের পাতা নিয়ে তৈরি হতে হতে সে বলে—আর দু-মিনিট। গরম চা পেয়ে যাবেন।

—আরে ছোঁড়া, এই করতে করতে তো তুই মিনিট পনেরো কাটিয়ে দিলি।

কেউ রাগ করলে বাপির মুখে একটা পাতলা হাসি ফুটে ওঠে। এগারো বছরের তার কমনীয় মুখের এই হাসিটার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে যেমন মেয়েলি হাসির এক প্রতিচ্ছায়া কারোর কারোর নজর এমন আভাসই ফুটে ওঠে। কেউ কেউ সেজন্যই চমকে ওঠে— হাসি দিয়ে ভুলাতে পারবিনি ছোকরা, জলদি চা ঢাল।

চা যে কী নেশার বস্তু তা বোধহয় এই এগারোর বালক হাড়ে হাড়ে টের পায় কেউ কেউ রেগে ওঠে সত্যিকারের রাগে তাদের কেউ এসে কান ধরে বলতেও পারে— কী বে, খুব দিল্লাগি হচ্ছে। কেউ কেউ বলেও এক আধ দিন। যারা বেশি চা-খোর।

কিন্তু এই সব টকটকে ক্ষিপ্ত কথার ওপরে যেন বরফ ঢলে পড়ে একবার ভাঁড়টা এগিয়ে দিতে তাতে চা ঢালার সঙ্গে সঙ্গে। তীব্র নজর দিয়ে উড়ন্ত ধোঁয়া দেখতে দেখতেই কেউ কেউ বলে ওঠে— ছোঁড়া যতই বাঁদরামো করুক চা-টাবানায় তোফা। দুঠোঁট বক্তার সুচলো হয়ে এগোয় ধোঁয়াটে চায়ের দিকে।

চা ঢেলে যায় বাপি। দোকানে যারা জমাট বেঁধে বসে তাদের খুশি করার পরেই তাকে ছুটতে হয়— এঘরে ওঘরে, যারা তার অপেক্ষায় বসে থাকে। দিন যত এগোয় তত তার দৌড়াদৌড়ি বাড়ে। দশতলা বাড়ির সবটা তো আর তার চায়ের কাঙাল নয়। এত যে ডিপার্টমেন্ট এই মস্ত বাড়িটার, সব তলাতেই প্রায় ক্যান্টিন ছাড়াও চায়ের ঠেক গজিয়ে উঠছে। কত, বাপি তার খবর রাখে না।

এবাড়ির নামটা শুনেছে সে বিদ্যাভবন। এখানে বহু মন্ত্রী আসে। বহু অফিসার আসে। তাও সে শুনছে। উচ্চ মধ্য নিম্ন শিক্ষার সব বিভাগ এখানে। সে কাজ করে একতলায়। নরেশদার দোকান এটা। মা তাকে অনেক বলে কয়ে রাজি করত তার লক-আউট হল। বাবা এখন তেলেভাজা বিক্রি করবে ফুটপাতে বসে, একছা ভাবছে। বলছেও। মা বলছে, তোমাকে দিয়ে ওসব হবে? এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে পার না।

বাবা ঠান্ডা গলায় বলে, চুপ। যা জানো না তা নিয়ে কথা বলো না। মানুষ সব পারে। আরো দুভাই বোন ইস্কুল যায়। আর মা দু-বাড়িতে বাসনমাজা, ঘর মোছার ঠিকে কাজ ধরেছে।

এবারে মাইকটা বাপির মুখে কাছে ধরা হয়—তোমার পড়তে ইচ্ছো করে না? এই প্রশ্নটাও করে জিনস্ পরা, গগলস বুকপকেটে গোঁজা বেশ মোটাসোটা এক দাদা।

ক্যামেরাও তখন নেমে আসে বাপির মুখের কাছে, প্রায় ক্লোজ আপ, বাপি বলে— আমি জানি না। বাড়িতে মা বাবা যা বলবে তাই হবে।

ইংরেজি এম ডি টি লেখা মাইকটা টেনে নেয় মোটাসোটা দাদা। যে আলো জ্বলছিল তা নিভে যায়। ক্যামেরা থেকে যায়।

বাড়িতে ফিরলে রাতে মা বলে— তুই কেন বললি না, কী করে পড়ব? বাড়িতে যে পাঁচটা লোক, তারা না খেয়ে মরবে

—আরেক দিন এলে বলল? বাপির প্রশ্ন। বাবার খবর বলবি না মানে, নিশ্চয়ই বলবি।

অমিমেষ জানা, মোটাসোটা তেইশ বছরের যুবক। যে কিনা এম জি টি-চ্যানেলের কর্তাদের বলে কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হাতের কাছেই এরা, শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি মাত্র সপ্তাহে পনের মিনিটের জন্য করছে, সে অবশ্য বলেছে— আমি যা দেব, দেখবেন স্যার, বাঙালি দর্শক নির্ঘাত খাবে। শিশু শ্রমিক আর তাদের জীবনধারণের অন্যান্য অন্ধকার দিকটা দর্শককে অ্যাপিল করতে বাধ্য। বাঙালি চিরকালের সেন্টিমেন্টাল

বাপি এবং আরো বাসিন্দার প্রতিবেদন প্রচারের পরেই পৃথক গোটা কথক, তার পরে ঝাঁক ঝাঁক চিঠি আসতে থাকে। কর্তা ব্যক্তিদের হিসেবরক্ষক এসে বিজ্ঞাপনের লেটেস্ট পজিশান জানান। টি আর পি ঊর্ধ্বগামী, লেগে গেলে কয়েক লক্ষ উঠে আসবে।

—অনিমেষ ক্যারি অন। কর্তার ভারি শ্রুতিমিষ্ট গভীর কণ্ঠস্বর।

যাকে ক্ষমতাবান বলা হয়

অমর মিত্র

লোকটা এক একজনের উপর লক্ষ স্থির করে। তার ক্ষতি করবে। জীবন হেল করে দেবে। লোকটা হেড অফিসের সর্বময় কর্তা। তার অধীনে কত অফিস জেলাজুড়ে। সব অফিসের সবাই তার কথায় ওঠে বসে। অসীম ক্ষমতাবান গম্ভীর লোকটিকে সবাই খুব ভয় করে।

একটা লোক তার অবাধ্য হয়েছিল। যে কাজ করা যায় না তা করতে চায়নি। তাকে লোকটা বদলি করে দিয়েছিল অনেকদূরে তিনটে নদীর ওপারে।

একটা লোক পঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিয়েছিল। লোকটা তাকে সাসপেন্ড করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। এমন রিপোর্ট দিয়েছে যাতে অবসরের আগে সাসপেনশন না ওঠে। এর ফলে সে পেনশন ইত্যাদিও পাবে না।

এই ব্যবস্থা যে লোকটা তার অবাধ্য হয়েছিল তার প্রতিও প্রযোজ্য হবে। লোকটার টার্গেটে সে আছে। আছে আরো অনেকে। অনেকের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করেছে। লোকটা। অনেকের প্রমোশন আটকে দিয়েছে। কেউ দশবারো বছর ধরে পড়ে আছে চারটে নদী পেরিয়ে এক দ্বীপে। তার আর বদলিই হয় না। সে এসে হাত কচলায় কাকুতি মিনতি করে। তখন লোকটার ভিতরটা বড় হয়ে যায়। তার কত ক্ষমতা। এসব কাজ না করলে ক্ষমতাকে আস্বাদ করা যায় না। এসব কাজ না করলে ক্ষমতা চেনান যায় না। ক্ষমতা না চেনাতে পারলে কেউ রেয়াৎ করে না। লোকটাকে দেখে সবাই কাঁপত। লোকটা তার অধঃস্তনদের বলত, যা বলব তা শুনতে হবে, করতে হবে, আমি যা জানি তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না।

ইয়েস স্যার।

লোকটা যদি ভুলও বলত, অধঃস্তনরা বলত ঠিক ঠিক ঠিক। লোকটার চেম্বারে পিছনের দেওয়ালে ঘড়িটির পাশে তখন টিকটিকি তার লেজ গজিয়ে দিত।

লোকটা একদিন, একটা ফাইলে এইরকম লিখেছিল প্রায়, সূর্য পশ্চিম দিকে ওঠে। অধঃস্তনরা বলল, ইয়েস স্যার, যা বলেছেন তাই ঠিক।

সেই ফাইল গেল তার বসের কাছে। ভগবানেরও তো ভগবান থাকে। বস বলল, না সূর্য উত্তর দিকে ওঠে।

বসের সঙ্গে সে দ্বিমত হলো। সে যদি হ্যাঁ বলে তাহলে তার আগের কথা খাটে না, পশ্চিমে ওঠে না সূর্য, ওঠে উত্তরে। তার বস সহ্য করতে পারল না এই অবাধ্যতা। অনেকদিন রয়েছে এক জায়গায়। বদলির আদেশ এল। একদিনেই তার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাকে নীচের ফ্লোরে এমন অফিসে পায়িছে দেওয়া হলো যেখানো কোনা কাজ নেই। অধঃস্তন বলতে একজন ডি. গ্রুপ, একজন ক্লার্ক আর অন্ধকার ঘর, ভাঙা কম্পিউটার। এখন ঝিম আসে লোকটার। যখন ক্ষমতা ছিল তখন একরকম, ক্ষমতাহীন হয়ে থাকাও আর একরকম। সারাদিন ঝিমোয় লোকটা। বিকেলে ভারী ব্যাগ বয়ে স্টপেজে বাসের জন্য অপেক্ষা করে। একদিন যখন ক্ষমতা ছিল...। লোকটা সেই কথা বলতে থাকে বাড়িতে, তার বন্ধুদের। ক্ষমতায় ছিল যখন সে কী কী করতে পেরেছিল...পেরেছিল এইরকম বলতে বলতে সে বুড়ো হতে থাকে। বুড়ো হওয়ার লক্ষণ তো এইসব। পুরোন অফিসের একজন এসে একদিন জিজ্ঞেস করে, কেমন আছে স্যার, কেমন কাটছে?

লোকটা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাক। চিনতে পার না। তবু বলল, খুব ভাল, কাজকম্মো অনেক, করে ওঠা যাচ্ছে না, সবাই রিটায়ার করে গেছে তো, এখানে সবাই আসে রিটায়ার করতে।

জগৎ পারাবারের তীরে

শংকর কুন্ডু

তিনি, অরণ্যবাসী ব্রহ্ম উপাসক সন্ন্যাসী, যাজ্ঞবল্ক্য, নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'হে শিষ্যগণ, শোনো, আমি আজীবন ব্রহ্মবাদী। মস্তিষ্কই আমাকে ব্রহ্মচর্চার দুরূহ পথে চালনা করেছে। সুতরাং মস্তিষ্কই শ্রেষ্ঠ। আমি তোমাদের মস্তিষ্ক নির্দেশিত পথে চলতে উপদেশ দিই।'

সেই থেকে মস্তিষ্ক শরীরের কেন্দ্র বলে উপাসিত হয়।

সময় যায়। একদিন শ্রীচৈতন্য আসেন পৃথিবীর এক অন্ধকার কোনে। যাজ্ঞবল্ক্য শ্রীচৈতন্যকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি আমার আদর্শ মানো তো?'

পথে পথে হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য বলেন, 'না। মস্তিষ্ক নয়, আমাদের প্রকৃত নিয়ামক প্রেম, অর্থাৎ প্রেমের উৎস হৃদয়। হৃদয়ই পারে মানুষের শ্রেণী, জাত, বর্ণ ভেদাভেদ দূর করে ভালোবাসার স্বর্গে উত্তরণ ঘটাতে। আমি অনুগামী ভক্তবৃন্দকে হৃদয়ের পথ ধরে নিয়ে যাই সাগরের পানে।'

সুতরাং, কেন্দ্র মস্তিষ্ক থেকে নেমে হৃদয়ে এসে স্থিতু হয়।

সমর যায়। আসেন মার্কস। শ্রীচৈতন্য মার্কসকে জিগ্যেস করেন, 'আমার প্রেমের বাণী তোমার হৃদয়কে আন্দোলিত করে না?'

গ্রন্থাগারের জ্ঞানসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে মার্কস উত্তর দেন, 'না। হৃদয় নয়, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রকৃত চালক হচ্ছে পেট। সর্বহারা শ্রমিকের খিদে মেটে না, যতক্ষণ না প্রভুর হাত থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হয়। সশস্ত্র বিপ্লবই পারে শৃংখলিত মানুষের প্রকৃত মুক্তি ঘটাতে। আমি শিষ্যদের ক্ষুধা দিয়ে সুধার জগৎ জয় করতে বলি।'

অতএব, কেন্দ্র হৃদয় থেকে নেমে পাকস্থলীতে এসে দাঁড়ায়।

কিছু কালের মধ্যেই চলে আসেন ফ্রয়েড। মার্কস ফ্রয়েডকে জিগ্যেস করলেন, 'আমার দর্শন তুমি সমর্থন করো নিশ্চয়ই?'

প্রয়ান্ধকার ঘরে, রাশি রাশি গবেষণা পত্রের মধ্যে বসে ফ্রয়েড বলেন, 'না। খিদে নয়। আসলে মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে যৌনতা। রিপুতাড়িত মানুষের চেতনা মনের অনেক নিচে অবদমিত কামনাগুলো থেকে যায় গোপনে। সারাজীবন সেই অবচেতনের ইচ্ছেগুলো স্বপ্নেদুঃস্বপ্নে তাড়া করে ফেরে। সমস্যা তো শরীরের জিনের ভেতর! এর থেকে মুক্তি? সহজ নয় হে!'

বহাবাহুল্য, কেন্দ্র পাকস্থলী থেকে আরো নেমে যৌনাঙ্গে এসে দাঁড়ায়।

সময়ের নিয়মে আসেন গান্ধি। নিজের বোনা একটুকরো কাপড় পরে, লাঠিতে ভর দিয়ে। ফ্রয়েড তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'তুমি আমার তত্ত্ব সমর্থন করো কী?'

গান্ধি উত্তর দেন, 'না। কামনা কেন্দ্র হতে পারে না। কাম-ক্রোধ-লোভের পূরণে মানুষের মুক্তি ঘটে না। মানুষের মুক্তি সত্যানুসন্ধানের পথে— সরল, সংযমী, অহিংস জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে। আমি শিষ্যদের বলি, হিংসা ভুলে, এসো আমরা অহিংসার পথে হাঁটতে থাকি।'

এরপর এক ভয়ংকর তর্কাতর্কি বেঁধে যায়। সেকী! কেন্দ্র বলে কি কিছুই নেই? কিছু থাকবে না? তা হয় নাকি?...

মহাগুরুদের ঝগড়ায় উত্তেজিত হয়ে শিষ্যরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নেমে পড়ে। চিন্তিত মুখে ছুটে আসেন আইনস্টাইন। মহাগুরুরা তাঁকে চেপে ধরেন, 'বলে কিছু বিশ্বাস করো কী না?'

আইনস্টাইন বলেন, 'কেন্দ্র, সত্য—এগুলো সব ধারণা মাত্র। সবকিছুই আসলে আপেক্ষিক। দ্রষ্টা যে বিন্দুতে অবস্থান করে, সেখান থেকে দৃশ্যমান জগতকে সে পরম সত্য মনে করে। কিন্তু গতিশীল বিশ্বে পরমই বা কী, সত্যই বা কী! হে বিদ্বান, গণিতের নিয়মে বাঁধা এই প্রকৃতি, এমন কী ঈশ্বরও। পাশা খেলারও ক্ষমতা নেই তাঁর!'

—না না না—মানা যায় না—হা কৃষ্ণ! প্রেম, বিরহ কি কিছুই না—খিদে - কামনা—যুক্তি-সব কি আপেক্ষিক?—কথার কথা? ...সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস বাড়তে থাকে... মহাসমুদ্রের উপকুল দিয়ে বাউল রবীন্দ্রনাথ দুহাত মেলে গেয়ে ওঠেন: 'জগৎ পারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা...'